দৈনিক

তারিখ 24 Jun 2008

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে তোলপাড়, গড়িয়েছে আদালতে

মামুন-অর-রশিদ ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে শুরু হয়েছে তোলপাড়। ঘটনা গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য বিদায়ী প্রশাসন আদালতে মিথ্যা তথ্য সরবরাহের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন, 'ফ্রড প্র্যাক্টিসে'র দায়ে। যত দিন যাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্তের সংখ্যা বাড়ছে। ৭শ' নয়, অবৈধভাবে ১১শ' ৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট থেকে এ তথ্য জানা গেছে। মাত্র ৮৪ পদের বিজ্ঞাপনের বিপরীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ১১শ' ৮৯ জন। ২৪টি পদে ঘুপচি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৭শ'। বিজ্ঞাপিত ২৪ পদে ৭শ' জনের নিয়োগ দান দেশে নিয়োগ কেলেঙ্কারি সকল অতীত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। অভিযোগ রয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে এই বিপুলসংখ্যক লোক অবৈধভাবে নিয়োগ দিতে কমপক্ষে ২০ কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য হয়েছে। অবৈধ নিয়োগ ঢাকতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য বিদায়ী প্রশাসন আদালতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ায় শুরু হয়েছে তুলকালাম। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন এসব নিয়োগে অনিয়ম ও জালিয়াতির সত্যতা লিখিতভাবে স্বীকার করেছে। মূলত জোট সমর্থক দু'টি গ্রুপের মধ্যে পজিশনকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ বিরোধ এই নিয়োগ কেলেঙ্কারি জনসমক্ষে নিয়ে এসেছে। জোট শাসনামলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনে

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পাতার পর)

৫শ' ৩৮ কর্মকর্তার নিয়োগ কেলেঙ্কারির চেয়ে বড় ঘটনা ঘটে গেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন রকম লিখিত পরীক্ষা ছাড়াই মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে এই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। একদিনের সাক্ষাতকারে ৭শ' জনকে নিয়োগ দেয়ায় প্রশ্ন উঠেছে 'ঔতিক' কিংবা 'অলৌকিক শক্তির' সহায়তায় এই নিয়োগ দেয়া হয়েছে কিনা। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক কোর্টে মামলা করেছেন। মামলায় সাত জনকে আসামী করা হয়েছে। মামলায় অভিযুক্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদের নামেও অভিযোগ উঠেছে। তবে তিনি নির্দোষ দাবি করেন। তিনি বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তবে যে দু'জন পত্রিকায় প্রকাশনার নামে ঘুপচি বিজ্ঞাপন তৈরির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং ২৪ জনের স্থলে ৭শ' জনের নিয়োগপত্র তৈরি ও নিয়োগপত্র সরবরাহ করেছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ কেলেঙ্কারি প্রতিষ্ঠানটি জন্মের পর থেকেই শুরু হয়। ১৯৯২ সালে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ' জারির মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ সালে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় প্রতিষ্ঠার এক দশকে প্রতিষ্ঠানের সুনাম লাটে ওঠে। কিন্তু বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট শাসনামলে এক অধ্যাপক উপাচার্যের দায়িত্ব নেয়ার পর শুরু হয় এই প্রতিষ্ঠানে 'গণনিয়োগ' বাণিজ্য শুরু হয়। তখন বিভিন্ন পত্রিকা রিপোর্ট করলে সরকার তা আমলে নেয়নি। বরং এসব রিপোর্ট মিথ্যা প্রমাণিত করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল থেকে সাংবাদিকদের চরিত্র হরণ করে চালানো হয় অপপ্রচার। জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার দেড় বছরের মাথায় এখন নিয়োগ-কেলেঙ্কারির সমস্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ব্যাপক অনুসন্ধান করে জানা গেছে, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে 'দি ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকায় এবং ১১ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজকালের খবর পত্রিকায় বিভিন্ন পদে মোট ২৪ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথা বলা হয়। এই বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী পদে ৭শ' লোক নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ভুয়া বলে উল্লেখ করে হাইকোর্টে মামলা করেন। এই মামলার পর কোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কপিটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আদালতে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোর্টের নির্দেশে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ফাইলে রক্ষিত বিজ্ঞাপন জমা দেয়। এতে এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বির দাখিল করা মামলা খারিজ হয়ে যায়। মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হাফিজুর রহমান আদালতকে অবহিত করেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত বিজ্ঞাপনের কপিটি 'সৃজনকৃত' এবং ঘুপচি বিজ্ঞাপন। পত্রিকার প্রেট সরবরাহ করে সেখান থেকে একটি অংশ উঠিয়ে এই বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে বলে তিনি আদালতকে অবহিত করেন। আদালত এই বিষয়টি জানার পর হাফিজুর রহমানকে জানায়, তার দেয়া তথ্য সত্য হলে তিনি এই বিষয়ে 'ফ্রড প্র্যাক্টিস' মামলা আদালতে অথবা থানা পুলিশে দায়ের করতে পারেন। আদালতের মতামত পেয়ে প্রভাষক হাফিজুর রহমান গত ১৬ জুলাই গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানায় 'ফ্রড প্র্যাক্টিস' ও জালিয়াতির ডকুমেন্টস দাখিলের মামলা করেন (মামলা নম্বর ৮৪, তারিখ-১৬/০৪/০৮)। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদসহ সাতজনকে আসামী করে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় জয়দেবপুর থানা পুলিশ ৪৭৮৮ (০৬/০৫/০৮) নম্বর পত্রের মাধ্যমে জাতীয়

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কপি বিজ্ঞাপনের জন্য পারিশোধিত বিলের কপি, বিজ্ঞাপন অনুসারে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নির্বাচনী বোর্ডের কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ভাইবা কার্ড, আবেদনকারীদের তালিকা, ভাইবা কার্ড ডাকে পাঠানোর রসিদ, ভাইবা কার্ড ইস্যু করার রেজিস্টার্ড খাতা অনুসন্ধান সহায়ক তথ্য হিসাবে চাওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন এই পত্র পাওয়ার পর স্মারক নম্বর জাতীঃ বি/প্রশাঃ/২০০৫ (অংশ-১)/১/৪২৬৮ পত্রের মাধ্যমে জানায় দু'টি পত্রিকার গোটা মাসের ফাইল প্রতিটি পাতা তন্ন তন্ন করে এমন কোন বিজ্ঞাপন না পাওয়ার বিষয়টি থানা পুলিশকে জানায়। একই সঙ্গে বিজ্ঞপ্তির জন্য বিল পরিশোধের কোন কাগজপত্র না পাওয়ার কথা জানান এবং একই সঙ্গে অন্য কাগজপত্র দিয়ে দেন। এই ঘটনার পর থানা পুলিশের তদন্তের প্রেক্ষিতে ইন্ডিপেন্ডেন্টের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক গোলাম তাহাবুর, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মৃদুল ভট্টাচার্য, জাতীয় গ্রন্থাগার, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদফতর পরিচালক তাদের স্ব-স্ব চিঠিতে ঐ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাপানো হয়নি বলে জানিয়ে দেন। এতে ঘুপচি-সৃজনকৃত বিজ্ঞাপন ছাপানোর তথ্য প্রমাণিত হয়। হাফিজুর রহমান জয়দেবপুর থানায় দায়েরকৃত মামলার সাবেক রেজিস্ট্রার শমসেরউজ্জামান, সহরেজিস্ট্রার মোয়াজ্জেম হোসেন, সদ্য বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ, উপরেজিস্ট্রার মোঃ সহিদুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার শের মোহম্মদ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের বিরুদ্ধে এই নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালের ৫ জুলাই মরহুম অধ্যাপক আফতাব আহমদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর গণনিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হয়। এই ঘটনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির নজরে আসলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির রিপোর্টের চার নম্বর তথ্যে বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় বিজ্ঞাপন দিয়ে ১১শ' ৮৯ জন নিয়োগ দিয়েছে। এই পরিমাণ জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে মোট এক শ' ৮৮ জন নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। এক শ' ৮৮টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও বিজ্ঞাপিত পদে নেয়া হয়েছে মাত্র ৮৪ জন। সেই বিবেচনায় ১১শ' ৫ জনের নিয়োগ হয়েছে কোন রকম বিজ্ঞাপন ছাড়া। এদিকে জাল-ঘুপচি ও সৃজনকৃত বিজ্ঞাপন দাখিলের পর হাইকোর্ট এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বির আবেদন খারিজ করে দেয়ার পর তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ ঐদিনই সিন্ডিকেট সভা ডেকে এ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ স্থায়ী করেন। অস্বাভাবিক দ্রুততায় এই নিয়োগ স্থায়ী করার ঘটনায় নিয়োগের সময় অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ জড়িত না হলেও পরবর্তীতে জড়িয়ে যান। গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপন দেয়া, বিজ্ঞাপিত পদের সংখ্যা, নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত চিঠি দেয়ার দায়িত্ব রেজিস্ট্রারের। এসব নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় বিজ্ঞাপন দেয়া, নিয়োগের চিঠি প্রদানসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন সাবেক রেজিস্ট্রার শমসেরউজ্জামান। জনকণ্ঠের পক্ষে কথা বলার জন্য চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে ২৪ পদে বিজ্ঞাপন দিয়ে ৭শ' কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকায় ছিলেন সাবেক রেজিস্ট্রার শমসেরউজ্জামান ও উপরেজিস্ট্রার মোঃ সহিদুর রহমান। এই দু'জনের কারোর সঙ্গেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের সাবেক ডিন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ এই নিয়োগ নিয়ে তার দায় প্রসঙ্গে জনকণ্ঠকে টেলিফোনে দীর্ঘ বক্তব্যে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার হিসাবে বিভিন্ন নিয়োগ কমিটিতে আমি ছিলাম। এসব নিয়োগ কমিটিতে আমি একা ছিলাম না। নিয়োগ দেয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা কমিটির নয়। কমিটি সুপারিশ করেছে, সেই সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছেন। আমি যেসব কমিটিতে ছিলাম তার সব ক'টি মিলিয়ে ক'জন সুপারিশ করেছি তা কাগজপত্র দেখলেই পাওয়া যাবে। তিনি প্রসঙ্গত বলেন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ কিংবা চূড়ান্ত নিয়োগপত্র পাঠানো নিশ্চয়ই কোষাধ্যক্ষের কাজ নয়। সুতরাং খামাখা আমাকে টেনে লাভ নেই। তিনি বলেন, একটা অনুষদের নির্বাচিত ডিনের দায়িত্ব পালনের অবস্থান শিক্ষকরা কোন দুর্নীতিবাজকে নিতে পারে না। আমি কোন অনিয়ম করিনি যা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি। তিনি বলেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করছি। এতে অনেকে ঈর্ষান্বিত হয়ে হয়ত আমাকে এসব অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার বৃথা চেষ্টা করছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশেদুল হাসান জনকণ্ঠকে টেলিফোনে বলেন, থানা আমাদের কাছে যেসব তথ্য চেয়েছিল সে সব তথ্য সম্পর্কে ফাইলে যেভাবে পেয়েছি